প্রাথমিক শিক্ষার সংকট ও সংস্কার ভাবনা

পরীক্ষিৎ চৌধূরী

গত মাসের শুরুতে প্রকাশিত একটি উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। ইউনিসেফ বাংলাদেশ ও ইউনিসেফ ইনোসেন্টি রিসার্চ এর যৌথ গবেষণায় দেখা গেছে, পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ৯১ শতাংশই নিজেদের শ্রেণির গণিত বিষয়ের অর্ধেক প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর দিতে পারেনি। বাংলা বিষয়েও পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক নয়; ৬৫ শতাংশ শিক্ষার্থী ন্যূনতম দক্ষতার মান অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। এই তথ্য স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করলেও বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে মানসম্মত শিখনের বড়ো ধরনের ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

একটি জাতির টেকসই অগ্রগতির ভিত্তি গড়ে ওঠে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ই হলো সেই স্থান, যেখানে শিশুর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুরু হয় এবং তার জ্ঞান, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও চিন্তা চেতনার ভিত্তি তৈরি হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে নানা ধরনের সংকটে জর্জরিত। শিক্ষার্থী ভর্তির হার কমে যাওয়া, ঝরে পড়ারর প্রবণতা, শিক্ষক সংকট, আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা এবং নীতিগত অসামঞ্জস্য সব মিলিয়ে এ খাতের চ্যালেঞ্জ দিন দিন আরও গভীর ও জটিল হয়ে উঠছে।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার কমে যাওয়া এবং ঝরে পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। হতদরিদ্র পরিবারের অনেক শিশু পর্যাপ্ত পুষ্টি ও মৌলিক চাহিদা পূরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। অনেকেই না খেয়ে বা অপুষ্ট অবস্থায় বিদ্যালয়ে আসে, ফলে তাদের পক্ষে নিয়মিত পড়াশোনায় মনোযোগ দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। আর্থিক সংকটের কারণে একসময় তাদের অনেকেই বিদ্যালয় ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে শ্রমবাজারে যুক্ত হতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে, অনেক অভিভাবক নিজেরাই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় শিক্ষার দীর্ঘমেয়াদি গুরুত্ব ও সম্ভাব্য সুফল সম্পর্কে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন না। ফলে সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর ক্ষেত্রে তাদের আগ্রহ ও উৎসাহ তুলনামূলকভাবে কম দেখা যায়।

এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। অনেক বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, মানসম্মত শিক্ষাসামগ্রী, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধার অভাব রয়েছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত ও দুর্গম অঞ্চলে বিদ্যালযের সংখ্যা অপর্যাপ্ত হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থীকে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বিদ্যালয়ে যেতে হয়, যা তাদের নিয়মিত উপস্থিতির ক্ষেত্রে বড়ো বাধা হিসেবে কাজ করে। ফলে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ ধীরে ধীরে বিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সমস্যা এখানেই শেষ নয়। দেশের অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এখনো পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। আবার যাঁরা কর্মরত আছেন, তাঁদেরও প্রায়ই সরকারি নির্দেশনায় বিভিন্ন শিক্ষাবহির্ভূত কাজে যুক্ত করা হয়। জরিপ কার্যক্রম, ভোটার তালিকা হালনাগাদ, টিকাদান কর্মসূচি কিংবা অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের কারণে তাঁদের উল্লেখযোগ্য সময় শ্রেণিকক্ষের বাইরে ব্যয় হয়। এর ফলে পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং শিক্ষার্থীদের শেখার ধারাবাহিকতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

একই সঙ্গে পর্যাপ্ত ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও অংশগ্রহণ ধরে রাখতে হিমশিম খান। শিশুকেন্দ্রিক ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাদান পদ্ধতির অভাব শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ কমিয়ে দেয়, যা পরবর্তীতে ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। অন্যদিকে তুলনামূলক কম বেতন, সীমিত পদোন্নতির সুযোগ এবং পেশাগত অনিশ্চয়তা শিক্ষকতা পেশাকে অনেকের কাছে কম আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ফলে মেধাবী ও দক্ষ জনশক্তিকে এই পেশায় আকৃষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

শিক্ষাখাতে বিনিয়োগের ঘাটতিও দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড়ো প্রতিবন্ধকতা। আন্তর্জাতিকভাবে জিডিপির অন্তত ৪ থেকে ৬ শতাংশ এবং জাতীয় বাজেটের ১৫ থেকে ২০ শতাংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দকে ন্যূনতম মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ এখনো সেই প্রত্যাশিত পর্যায়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি। আরও উদ্বেগের বিষয়

হলো, সীমিত বরাদ্দের মধ্যেও অনেক ক্ষেত্রে অপচয়, অদক্ষতা এবং দুর্নীতির কারণে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। ফলে শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার মানোন্নয়ন কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়।

এই বহুমাত্রিক সংকট মোকাবিলায় প্রথমেই শিক্ষা খাতে সরকারি বিনিয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পাশাপাশি বরাদ্দকৃত অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে কঠোর অডিট ব্যবস্থা, জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রতিটি পর্যায়ে দক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে জনগণের অর্থ প্রকৃত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় হয়। শিক্ষক সংকট নিরসন ও পেশাগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও দ্রুত ও কার্যকর সংস্কার প্রয়োজন। শূন্য পদ দ্রুত পূরণ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ এবং বিষয়ভিত্তিক দক্ষ নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা করা প্রয়োজন। পাশাপাশি শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত ও মানসম্মত পেশাগত প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে, যাতে তাঁরা আধুনিক শিক্ষণ-পদ্ধতি ও প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারেন। একই সঙ্গে শিক্ষকদের প্রশাসনিক ও শিক্ষা বহির্ভূত কাজ থেকে মুক্ত রেখে তাঁদের মূল দায়িত্ব পাঠদান ও শিক্ষার্থী মান উন্নয়নে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষা আরও শক্তিশালী করা জরুরি। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০ পর্যায়ে আনা, নিয়মিত শিখন মূল্যায়ন পরিচালনা এবং দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য রেমেডিয়াল শিক্ষা কার্যক্রম চালু করতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতা ও শিখনফল উন্নত হবে। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধিও সমান গুরুত্বপূর্ণ। জরাজীর্ণ বিদ্যালয় সংস্কার, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করার পাশাপাশি ধাপে ধাপে বিদ্যুৎ, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ করতে হবে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ ধরনের বিনিয়োগের কোনো বিকল্প নেই।

শিক্ষা প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও তদারকি জোরদার করতে নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন, প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। একই সঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থায় অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও প্রকল্পনির্ভর হস্তক্ষেপ কমাতে হবে। শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধে মিডডে মিল কর্মসূচির সম্প্রসারণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি বৃদ্ধি এবং বিদ্যালয়কে আরও শিশুবান্ধব পরিবেশে রূপান্তর করা জরুরি। পাশাপাশি অভিভাবক, স্থানীয় শিক্ষা কমিটি ও সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।

বর্তমানে কোচিং সেন্টার ও গাইডবইয়ের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা শ্রেণিকক্ষভিত্তিক শিক্ষার দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে। অনেক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠদান থেকে কাঙ্ক্ষিত সহায়তা না পাওয়ায় কোচিংয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে শিক্ষক সংকট, অতিরিক্ত কর্মভার এবং সীমিত সুযোগ-সুবিধা এই প্রবণতাকে আরও উৎসাহিত করছে। শিক্ষা খাতের আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত জাতীয় শিক্ষা দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। শিক্ষা কমিশনের বিভিন্ন সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়া এবং ঘন ঘন পাঠ্যক্রম পরিবর্তন পরিকল্পনার ধারাবাহিকতার ঘাটতি তুলে ধরে।

তবে আশার কথা হলো, প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে আধুনিক, একীভূত ও স্মার্ট করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জন্য ৪৬ হাজার ৭৩৭ কোটি ৯২ লাখ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সঙ্গে শিক্ষাক্রম সংস্কারে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বগুণ এবং মানবিক চরিত্র গঠনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে, যাতে শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম না হয়ে বাস্তব জীবনোপযোগী দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে বর্তমানে সরকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৪), যা চলতি মাসে সমাপ্ত হওয়ার কথা। এছাড়া চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প আগামী ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান থাকবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এসব প্রকল্পের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ঢাকা মহানগর ও পূর্বাচল এলাকায় বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এবং কক্সবাজার, বান্দরবান ও ভাসানচর অঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প আগামী বছরের জুন পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও ভৌগোলিকভাবে পিছিয়ে থাকা অঞ্চলের শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

শিক্ষার্থীবান্ধব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্কুল ইউনিফর্ম, জুতা ও স্কুলব্যাগ বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে তাদের জন্য বিশেষায়িত সহায়ক প্রযুক্তি, উপযোগী শিক্ষাসামগ্রী এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে, যাতে কোনো শিশুই শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

#

লেখক : সিনিয়র তথ্য অফিসার

পিআইডি ফিচার